

## সাম্প্রদায়িকতা : বহুরূপে সম্মুখে তোমার



**সংবাদ** রবিবার। জুন ১১, ২০০৬

**অজয় দাশগুপ্ত।।**

**লেখক : প্রাবন্ধিক/কলাম লেখক, সিডনি**

নব্বইয়ের দশকে বন্দর-নগরী চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল গভীর রাত। মধ্য যামিনীতে যে ট্রেনটি চাটগাঁ ছেড়ে যায় তাতে টিকেট পাওয়াও সহজ কিছু ছিল না। তখন আমি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত। কাজের কারণে প্রায়ই ছুটতে হতো রাজধানীতে। এমনি এক যাত্রায় পরিচয় ঘটেছিল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। যা হয়, সচারচর যা ঘটে সেভাবেই আলাপ। গন্তব্য একই। যাত্রার ধরনও প্রায় অভিন্ন। পাশাপাশি বসে সারারাত নিস্তরক, নিঃশুপ পথ পাড়ি দেয়া? দেশের প্রেক্ষাপটে অবাস্তব, অসম্ভব। চা, নাস্তা, সিগারেটের বিনিময়ে জমে ওঠা আলাপ ক্রমেই গভীর হতে শুরু করল। দেখা গেল আমাদের রাজনৈতিক মতামতও সমার্থক। তখন বিএনপির রাজত্বকাল। স্বৈরাচার পতনের পর ধূমায়িত বিক্ষোভের অবসান ক্লান্ত মানুষের প্রত্যাশা সুশাসন, আর্থিক প্রগতি, তা কিন্তু হচ্ছিল না; বরং প্রথমবারের মতো শাসন ক্ষমতায় গণতন্ত্রের আড়ালে-আবডালে বেড়ে উঠছিল একনায়ক-তন্ত্রের ছায়া। মৌলবাদের সঙ্গে আপস আর ক্ষমতা ভাগাভাগির আলামতও তখন স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক কারণেই আমাদের আলাপচারিতায় এসব বিষয় উঠে আসছিল বারবার। উভয়ের মতামত প্রায় কাছাকাছি বলে সে আলাপ হয়তো একপর্যায়ে থেমে গিয়ে অন্য কোন বিষয় চলে আসত। সে দিকে যাওয়ার সুযোগ মিলল না সামনের সিটে বসা ভদ্রলোকের আপত্তি আর প্রাণবন্ত বিতর্কে। তিনিও ঢাকাগামী, ধনী ব্যবসায়ী। একরকম জোর করেই ঢুকে পড়লেন আমাদের আলাপে। উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, দামি সিগারেট আর পোশাকেই বোঝা গিয়েছিল ওপরে ওঠার সিঁড়ি তখন তার পায়ের তলায়। পাশের ভদ্রলোক অর্থাৎ যিনি আমার দলের তিনি খানিকটা অধৈর্য আর অসহিষ্ণু। এই ভদ্রলোকের বিএনপিপ্রীতি তাকে অস্থির করে তুলছিল। আমার কিন্তু মন্দ লাগছিল না। বিএনপির পক্ষে তার উত্থাপিত যুক্তি-তর্কের মোকাবেলায় মাঝে মধ্যেই দিশেহারা সহযাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বলছিলাম নিজের মতামত। মানতেই হবে ক্ষিপ্ত, স্পষ্টভাষী, বিএনপি সমর্থক যাত্রীটির ক্ষুরধার বক্তব্যের চাপে আমরা প্রায়ই আশ্রয় নিচ্ছিলাম অতীতে। মনে হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু সাড়ে ৩ বছরের সামান্য ক্ষমতার কাল ছাড়া বাকি সময়টুকু তো এলেই হাতছাড়া আর রাজপথের সময়।

রাজপথে আন্দোলন হয়, সরকারের ওপর আর চাপ দেয়া যায়, বাধ্য করে দাবি-দাওয়া মানিয়ে নেয়া সম্ভব; কিন্তু প্রত্যক্ষ উন্নয়ন বা দর্শনযোগ্য কিছু করে দেখানো অসম্ভব। ফলে নতুন প্রজন্মের চোখে যা উন্নয়ন, যত স্কাই-স্কাইপার, সেতু, বাজার, ব্যবসা সবই মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতির বাইরে অবস্থিত দলের ক্ষমতাকালে তৈরি। ফলে তাদের পোষ মানানো বা বুঝিয়ে তোলা সহজ কর্ম নয়। পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনার ৫ বছর শাসনামলে সে খেদ কিছুটা ঘুচেছিল। যাই হোক, উত্তপ্ত আলাপের পর কাকডাকা কুয়াশামাখা ভোরে কমলাপুরে পৌঁছে পারস্পরিক কুশল কামনায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েই বিদায় নিয়েছিলাম আমরা। সহযাত্রীটি অর্থাৎ যিনি আমার মতামতের পক্ষে তিনি ট্যাক্সি ধরা পর্যন্ত সঙ্গে রইলেন, ঢাকার আকাশে তখন ঘন লাল সূর্য উঁকি দিচ্ছে মাত্র। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে হাতে হাত রেখে বিদায় নেয়ার সময় বললেন ‘ভাইজান, বড় ভাল হলো আলাপ হয়ে, দেখেন এত কথা হলো, অথচ আপনার নামটাই জানা হলো না।’ নিজের নামটা বলে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। আমি সপ্রতিভভাবেই নিজের নাম ও পদবি উল্লেখ করে দেখি কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। প্রস্থানোদ্যত ভদ্রলোক দু’পা এগিয়ে ফিরে এলেন, কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন ‘ভাইজান কিছু মনে করবেন না, অনেক কথা বলে ফেলেছি, আমি ভাবি নাই যে আপনি হিন্দু।’ আমার বিস্ময় তখন চরমে, তবে এতো নতুন অভিজ্ঞতা নয়। ফলে কথা না বাড়িয়ে আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় হই। ‘না না, ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই’ বলি বটে; মনে মনে ভাবি, হায়রে সমাজ, হায় আমার ধর্ম! রাজনীতি, অর্থনীতি, দলীয় ঐক্য, পোশাক, ভাষা, খাবার সব মিলে গেল শুধু নামের জন্য রয়ে গেল এক বিশাল শূন্য হাহাকার। এ কী কোনদিনও ঘুচবে না?

২ বছর কি তারও কিছু পর পারিবারিক ভ্রমণে ভারতের পথে পাড়ি দিই। উদ্দেশ্য তীর্থ ও সফর। পবিত্র আজমীর শরীফ, কাশী মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে কোলকাতা। এ যাত্রায় আরেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। বলা বাহুল্য, তীর্থযাত্রায় কোন বিলম্ব বা অসুবিধা ঘটেনি। যদিও বাঁধনহারা গরুর মিছিল ক্লান্ত মথুরা, খানখান্দে ভরা বৃন্দাবন আমাকে টানেনি। মন্দির নিভৃত্তে নিবিড়, ঘনিষ্ঠ বঙ্কিমভঙ্গিতে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা যতটা টানে, রাজপথে ঘুরে বেড়ানো ধর্মীয় পাণ্ডা আর পুরোহিতের উৎপাত ততটাই বিরক্তিকর। এমন এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে কলকাতা ফিরে আসি। কোন এক জরুরি কাজে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে যেতে হয়। পাসপোর্টের মেয়াদ অথবা ভ্রমণকাল বিলম্বজনিত ত্রুটি মোচনের যে কোন একটি। প্রথমদিন ভদ্রলোক ভাল ব্যবহার করে বিদায় দিলেন বটে, দ্বিতীয় সাক্ষাতে মুখ খুললেন।

ঃ আপনি তো হিন্দু নিশ্চয়ই?

ঃ জি।

ঃ তাহলে জি বলছেন কেন? জল কে পানি বলছেন? আরে মশাই, ওসব দেশ ছেড়ে চলে আসুন। তাহলে বাঁচার মতো বাঁচতে পারবেন।

পাসপোর্টটি তখনও তার কজায়। ক্রোধ সংবরণ করে মিনমিনে গলায় বলি

ঃ না, তা কি করে হয়। সে তো আমারই দেশ, তাছাড়া এখানে এসে কী করব বলুন?

তেড়ে ওঠেন তিনি বললেন ‘গড়িয়াহাটের ফুটপাতে গেঞ্জি বিকোবেন। এই যে আমি। ২০ বছর আগে এসে হকারি থেকে লজেন্স ফেরি সবই করেছি মশাই।’ তারপর দু’হাত উপরে তুলে গায়েবী প্রণাম ঠুকে বললেন ‘এখন বেচ (বেশ) আছি। পাসপোর্টের নয়-ছয় আর টিউশান করে দিবি চলো যাচ্ছে।’

পাসপোর্টটি ফেরৎ নিয়েই স্মৃতিতে ফিরে যাই, বলি আচ্ছা, কলকাতার বাইরের লোকরা যে হিন্দিতে জলকে পানি বলে ওইসব হিন্দুর শাসনে থাকতে লজ্জা করে না আপনাদের? আর গড়িয়াহাটায় গেঞ্জি বিক্রি করে থাকতে হবে কোন দুঃখে? অতঃপর পাসপোর্টের দালালি? নৈব নৈব

চ। তারপর একহাত নেই তাকে। বিনয় ভট্টাচার্যের মুখে অপরাধের ছায়া দ্রুত বিতারিত হয়। তাকে আমি নির্দিধায় জানিয়ে দিই তার মতো নপুংসক, পলায়নপর দেশত্যাগী গেঞ্জি বিক্রি করে হিন্দুত্বে বসবাসের আকাজক্ষাধারীদের জন্যই আজ এ অবস্থা। নইলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করা আরও সহজ হতো। ‘সংখ্যালঘু’ বলে তোলপাড়ের প্রয়োজন পড়ত না। ভারতে শরণার্থী হওয়ার চেয়ে বাংলাদেশের অযুত সংখ্যাগুরু মুসলিম প্রগতিশীল বন্ধুদের সঙ্গে থেকে লড়াই করে মৃত্যুবরণ শ্রেয় জানিয়ে বিদায় নিই, ভদ্রলোক এমন আচরণ আশা করেননি। কেন জানি কঁকড়ে থাকলেন। বিড়বিড় করে বলছিলেন হয়তো ভুলই করেছি। আমার একটি হাত তার হাতের ভেতর নিয়ে বললেন জন্মভূমিই মা, বুঝলেন মশাই। তাকে ছেড়ে আসা আসলেই পাপ।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এ পাপ যেন স্পর্শ না করে সে বিষয় আগাগোড়া সচেতন থাকার পর নব্বইয়ের মাঝামাঝি প্রশান্তপাড়ে অভিবাসন নিয়ে চলে আসি। ধারণা ছিল এতে অন্তত একটা লাভ আছে, ডলারের জোর আর উন্নত দেশের সচ্ছলতা, বিদ্যা, অভিজ্ঞতার বিনিময়ে এক সময় দেশে গিয়ে নিশ্চয়ই কিছু করা যায় বা যাবে। তাছাড়া বৈধ অভিবাসনে দু’দেশের নাগরিকত্ব থাকার ফলে আইনেরও কোন মারপ্যাচ থাকে না।

এখানেও শান্তি কোথায়? সিডনির প্রেক্ষাপটে জটিল, সমস্যাঘন আচরণ দেখে এটুকু বুঝতে পারি অবিশ্বাস আর সন্দেহের ফ্রেমবন্দি বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক চাঁদে গেলেও মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে না।

বাইরের বাঙালিও এ আচরণের বাইরে নয়। যে কারণে আমাদের দেশপ্রেম, বঙ্গবন্ধু প্রীতি, আদর্শ বেঁধে নিয়ে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্টতা দেখানো হয়। স্বয়ং গাফফার ভাইকেও ছেড়ে কথা বলে না লন্ডনের পুঁচকে পত্রিকা বা অন্য মিডিয়ার কার্যত সম্পাদক। জনসংখ্যা ও মেধা অনুপাতে সীমাবদ্ধ বাঙালি জগতে সবাই নিজেকে নিয়ে গর্বিত। ফলে এ গর্ব অন্যকে সহ্য করবে কোন দুঃখে? আমার এক পরম হিতৈষী ধর্মপ্রাণ মুসলমান বন্ধু সুখ-দুঃখে প্রায়ই পাশে দাঁড়ান, হেদায়েত করেন। তিনিই সেদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন দেখুন, আপনার ক্ষেত্রে আচরণ আর আক্রমণে পরস্পরবিরোধীরা কেমন একাট্টা? এর কারণ জানেন? ঠিক বুঝতে পারি না বলে ড্যাভড্যাভে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি। ভদ্রলোক বলেন আরে মশাই, আপনার হয়ে কেউ শাসাতে যাবে না যে; কারণ আপনি হিন্দু তার ওপর আওয়ামী ঘরানার লোক। ফলে কুৎসা আর সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ঘায়েল হবেন না তো কী ফুল চন্দন দিয়ে বরণ করা হবে?

আমি ঠিক একমত হতে পারি না, মতলববাজ কে বা কারা সাম্প্রদায়িকতা আর প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে বললেই মানুষ তা মানে এটা জানি, মানি না। তাছাড়া ব্যক্তিগত দেয়ালিকায় কেউ দেশবিরোধী বা সাম্প্রদায়িক বললেই কি তা জায়েজ হয়ে গেল? কে ওই ব্যক্তি, কে অধিকার দিয়েছে এসব বিষয়ে কথা বলার? এটা মূলত মৌলবাদী চক্রের ইন্ধনে সাম্প্রদায়িকতার আন্তর্জাতিক আচরণ। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে দেশে কলা, মুলা খেয়ে বিদেশে ঘি-মধু পানের পর জেহাদি হুঙ্কার, যা কেবলই বায়বীয়।

আমার মন পড়ে রয় পদ্মার পাড়ে। এবারও কি সাম্প্রদায়িকতার কারণে জোট বা প্রগতিবিরোধী শক্তি ক্ষমতা পেয়ে যাবে? আবার কি তীরে এসে তরী ডুবে যাবে প্রগতির? ভোটের দিন বাজারে গুজবে ‘আগরতলা’ হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সাকা’র চোখ রাঙানো, মওদুদের মিথ্যাচার আর জামায়াতি সন্ত্রাসে দেশ পিছিয়ে পড়বে? জাতির ভাগ্যাকাশে কী উদিত হবে না সম্ভাবনার দিবাকর? তাহলে আমাদের কী হবে? আমরা যে মনে মনে প্রার্থনা করি ‘মাগো তোমার বুকে ঘুমিয়ে গেলে জাগিয়ে দিয়ো নাকো’? সে মাটিতে কী ঘুমোতে পারবে না বাঙালি, বাংলার সন্তান।

**লেখক : প্রাবন্ধিক/কলাম লেখক, সিডনি**